সিদ্ধার্থ সেন

সময়-স্মৃতি-স্বপ্ন ঃ আন্দ্রেই তারকোভস্কির চলচ্চিত্র

গল্পটা এরকম হতে পারত…। গল্পের নায়ক আলেকজাণ্ডার, মরণোন্মুখ—মারাত্মক ক্যান্সারে আক্রান্ত। দিনের পর দিন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে-শুনতে, মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে একদিন সত্যিসত্যিই দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজার সামনে এক রহস্যময় ডাকপিয়ন অদ্ভুত এক বার্তা নিয়ে হাজির। আলেকজাণ্ডারকে এক মায়াবী নারীর শয্যাসঙ্গী হতে হবে সেই রাতেই—লোকে তাকে ডাইনি বলে জানে। এ ছাড়া, আলেকজাণ্ডারের নাকি পরিত্রাণ নেই—মৃত্যু তার অবধারিত। আশ্চর্য সেই রাতে মায়াবিনীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল আলেকজাণ্ডার। ভবিষ্যতে সেই নারীর যে কোন আদেশ যে কোন মূল্যে শিরোধার্য হবে—এইরকম বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হল। ভোর হয়ে এলে ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে আলেকজাণ্ডার আবিষ্কার করল তার অসুখ সেরে গিয়েছে। বাড়িতে ফিরে এলে ডাক্তার আলেকজাণ্ডারকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বলে ঘোষণা করল। নতুন পৃথিবীতে নতুন করে যখন তার জীবন শুরু ঠিক তখনই একদিন দরজায় আবার ঘণ্টা বেজে ওঠে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই নারী। মুহূর্তের আদেশে মায়াবিনীর সঙ্গে আলেকজাণ্ডার ছেড়ে চলে গেল তার এতদিনের সংসার। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, প্রাসাদোপম অট্টালিকা আর ধনসম্পদ। কাঁধে তার বহুদিনের পুরনো একটা কোট।

ধু ধু করা জীবনের এক অচেনা প্রান্তরে অজানা নিরুদ্দেশ যাত্রা তার পেছনের সব কিছু ফেলে দিয়ে, তবু এক তীব্র আনন্দ, অদ্ভুত সুখে পরিপূর্ণ হয়ে গেল তার মন এই সর্বস্ব আত্মদানে। এই ছিল আন্দ্রেই তারকোভস্কির অসাধারণ চলচ্চিত্র 'আত্মদান' ('স্যাক্রিফাইস') এর প্রথম খসড়া। শুধু চলচ্চিত্রের খসড়াই নয়, তারকোভস্কির একান্ত, নিজস্ব অন্তর্জগতের একটুকরো নকশা ধরা পড়ে যায় এই খসড়ায়—যা আপামর ভোগসর্বস্ব, যন্ত্রপীড়িত আমাদের এই আধুনিক সভ্যতার সর্বব্যাপ্ত ভোগবিকারকে প্রবল অনীহায় খারিজ করতে চায়। আর খারিজ করে দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগও গ্রহণীয়। তাই প্রকৃতির কাছে (প্রতীকীভাবে নারীর কাছে) সেই সর্বস্ব ত্যাগের, আত্মদানের তীব্র সুখ বহন করে চলে তারকোভস্কির শিল্পজগৎ।

ভোগসর্বস্বতার প্রতি প্রবল অনীহার শিল্পরূপ অনেক দেশেই অনেক সময়ে নিজস্ব ধারায় প্রবহমান—তার একান্ত রুশীয় চেহারা ডস্টয়েভস্কি কিংবা তলস্তয়ের গল্প উপন্যাসে খুব প্রবল ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সন্দেহ নেই, তারকোভস্কি ছিলেন বরাবরই ডস্টয়েভস্কির প্রবল অনুরাগী। ডস্টয়েভস্কির 'ইডিয়ট' নিয়ে ছবি করবার বাসনা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই পরিকল্পনা পরে পরিত্যক্ত হয় এই ভেবে যে শুধু একটি উপন্যাস নিয়ে ছবি করলে ডস্টয়েভস্কির বিশাল মানসিক জগতের একটা সামান্য অংশই কেবল ধরতে পারা যাবে। অতএব প্রয়োজন গোটা ডস্টয়েভস্কিকে নিয়ে ও তাঁর সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম নিয়ে ছবি করা। তলস্তয়ের 'ইভান ইলিচের মৃত্যু'ও ছিল তারকোভস্কির অত্যন্ত প্রিয় এবং তাঁর ছবি করার অসম্পূর্ণ পরিকল্পনার অন্তর্গত। কিন্তু তারকোভস্কির মানসিক জগত আরো জটিল এবং বিচিত্র, বহুস্তরবিশিষ্ট যা 'সিনেমা'—এই বিশেষ শিল্পরূপটির আধুনিক পরিব্যাপ্তির এবং অন্তর্মুখিনতার বৈশিষ্ট্য বহন করে চলে।

কিন্তু কেন এই ভোগসর্বস্বতার প্রতি প্রবল অনীহায় মর্মকামী এক আত্মদানের আত্মধ্বংসী আত্মমন্থন যা সমুদ্রমন্থনের মতনই তাঁর সৃষ্টিজগতকে তোলপাড় করে তুলেছে। শুধু 'স্যাক্রিফাইসেই' নয় 'নস্টালজিয়া' এবং অনেক অংশে 'আন্দ্রে রুব্‌লভেও' প্রকট হয়ে আছে এই আত্মধ্বংসী মন্থন। একি শুধুই খৃষ্টীয় আত্মদানের প্যাশন প্লে? নাকি আজকের মানসদর্পণে যন্ত্রসভ্যতার উষর মরুভূমির আকাশ বাতাস কাঁপানো এক হাহাকার, দৃষ্টিহীনের দেশে হারিয়ে যাওয়া নির্জন এক চক্ষুষ্মানের নতুন করে মাটি আর আর আকাশের রঙের খেলা আর মানুষের হৃদয়ের আলো চিনে নেবার আকুল আর্তি? কিন্তু কী করে মানুষ মানুষের সন্ধান পাবে। যন্ত্রপীড়িত সমাজের পণ্যসর্বস্বতার

প্রবল শাসনে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্রও পণ্যে পরিণত। মিডিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপ চলছে সেখানে।

অথচ শুধু আলাপে, শুধু কথায়-কথায় একদিন মানুষের যোগসূত্র ঘটত। শব্দ ছিল সত্য। শব্দ ব্রহ্ম। তাই স্যাক্রিফাইস ছবির গোড়ায় আলেকজাণ্ডার বলে 'ইন দি বিগনিং দেয়ার ওয়াজ দি ওয়ার্ড।' কিন্তু কালক্রমে শব্দ তার মহিমা হারায়। কথাশিল্পে জড়িয়ে থাকে ভানভণিতার বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রকরণ। কথার মায়ায় জড়িয়ে পড়ে 'কথা'। বাক্যই হয়ে দাঁড়ায় বাস্তব এবং নকল বাস্তবের সঙ্গে, নকল ছায়ার সঙ্গে কুস্তিবাজির অবলম্বন।

কথার জোরে হয়কে নয় শুধু নয়, কথার দাস বানিয়ে মানুষকে করা যায় কলের পুতুল। যেন এইরকম কথার সঙ্গেই না জেনে আড়ি করে থাকে আলেকজাণ্ডারের ছেলে (আসলে তারকোভস্কির সবচেয়ে ছোট ছেলের প্রতিরূপ—যাকে ছাড়া নির্জন প্রবাসে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তারকোভস্কির জীবনযাপন)। ছোট্ট ছেলেটির গলায় একটা অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তাই তার কথা বলা বারণ। আলেকজাণ্ডার কিন্তু কথা বলে চলে। শুধু কথা, অনেক কথা। থিয়েটারের নাম করা লোক ছিল একসময়ে অতএব কথাতো তার অবলম্বন হবেই। এইখানে সিনেমার শিল্পরূপেরও একটা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা রয়ে গেছে। এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিল্পরূপ হিসাবে সিনেমা 'কথাকে' অতিক্রম করে যায়। শুধু শব্দ আর দৃশ্যের মিলনেই সিনেমা নয়। তাহলে তো শুধু কথাশিল্প অথবা চিত্রশিল্প দিয়েই সিনেমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে ফেলা যায়। শুধু চোখ ভরে দেখা আর কান ভরে শোনা অতিক্রম করে সিনেমা এক নিজস্ব অনুভূতির জগতে নিয়ে যায় আমাদের, যেখানে বর্ণনা, দৃশ্য বা শ্রুতি কোনটা দিয়েই তাকে ধরে রাখা যেতে পারে না। ভাষার যে নিজস্ব রূপ এবং জগৎ আছে সেখানে চলে অবিরত নির্মাণকার্য; ব্যাকরণ কিংবা লোকপ্রচলিত ব্যবহার দিয়ে। জগৎ বা প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে ওঠে ভাষার মারফত তার ওপর ভাষার জগতের নির্মাণকার্যের নিজস্ব কারিকুরি আছে, আছে তার নিঃশব্দ খবরদারি। ফলে ভাষার কারুকার্য এবং ওই কারুকর্ম প্রভাবিত মননের ধারাতেও বাস্তব সম্পর্কিত ধারণার বিকার ঘটে চলে অনবরত—কিন্তু এত স্বাভাবিক ভাবে যে সেটাই মনে হয় অনিবার্যভাবে গ্রহণযোগ্য। স্থিরচিত্র বা চিত্রশিল্পেরও একইরকম একটা মজার ব্যাপার আছে।

সেখানে এক বিশেষ মুহূর্তের এক বিশেষ রূপ উদগ্র হয়ে ওঠে, যেন সময়ের ঘড়ি থমকে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওই বিশেষ ক্ষণটিই একমাত্র সত্য যা শাশ্বত

হয়ে ওঠবার চেষ্টায় ব্যাকুল। এখানে সময়প্রবাহের বিকার ঘটে চলে অনবরত এবং জেনে শুনেও সেই বিকার গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে কেননা বড় মোহময়, বড় সুন্দর এই কালবিকৃতি, যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে ওই বিশেষ শিল্পের সাফল্য।

কিন্তু ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ে যাওয়া চলমান বাস্তব চলচ্চিত্রে হাজির হয় প্রকৃতির রঙঢঙের বহুবিচিত্র, বহু স্তর বিশিষ্ট নানা সম্ভাবনা নিয়ে। সময়প্রবাহের উপর ভর দিয়ে বাস্তব কিংবা প্রকৃতির বিচিত্র রূপবর্ণময়তা তার রহস্যের পাখা মেলতে পারে পুরোদমে একমাত্র এই 'সিনেমা' নামক শিল্পরূপটিতেই।

অতএব বাস্তবের অনেক বেশি সত্য অনেক বেশি করে আত্মপ্রকাশ করতে পারে চলচ্চিত্রে (এবং অতএব, একইসঙ্গে বাস্তবের অনেক বেশি বিকৃতি অনেক বেশি মনোগ্রাহী 'illusion'ও জোরাল অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে এই সিনেমা)।

তাহলে আমরা 'কথা'য় ফিরে যাই আবার। সেই নির্ভেজাল আদিকথা যা দিয়ে সত্যিকারের যোগসূত্র রচিত হত একসময়, আমাদের এই পণ্যসভ্যতার আগে। এই 'কথা' দিয়েই উচ্চারিত হত মন্ত্র, প্রার্থনা। আমরা আজকাল প্রার্থনা করতেও ভুলে গেছি। অথচ রোজ একই সময় যদি অভ্যাসবশতঃ এবং শ্রদ্ধাসহকারে কোন নিয়মিত কার্যপদ্ধতি নেওয়া যায় এবং তার সঙ্গে যদি উচ্চারিত হয় কোন প্রার্থনা তবে সে প্রার্থনা সফল হবেই। এখানে সেই গল্পটার উল্লেখ আছে। এক পাতাবিহীন মরা গাছ পুঁতে দেওয়া হয়েছিল পাথুরে পাহাড়ের ওপর। কাছাকাছি ছিল একটা আশ্রম। সেখানকার এক ব্রহ্মচারী নিয়মিত সেই মরা গাছটার গোড়ায় জল দিত আর প্রার্থনা করত যেন তার প্রাণসঞ্চার হয়। রোজ একইভাবে চলত সেই কাজ। তারপরে সত্যিসত্যিই একদিন দেখা গেল পাতায় ভর্তি সজীব সেই গাছটা ডালপালা মেলে ধরেছে আকাশের দিকে। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধিপরিচালিত মোহান্ধ আজকের মানুষ ওসব বেনালুম ভুলে গিয়েছে। তাই এত অশান্তি। ভোগের বিকট প্রাচুর্যের ভিতরেও ঘরে-ঘরে উন্মাদনা, অসহনীয় জীবনযাপন। জীবনের সব আনন্দ, সব ভালবাসা যেন মুছে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে, বেঁচে থাকাই অর্থহীন। তারই এক বিকট উদাহরণ অ্যাডিলেড, আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী। নিজের স্বার্থ ছাড়া সে কিছু বোঝে না। অন্যের প্রয়োজন, অন্যের ভাল তার ধারণার মধ্যেই নেই। ফলে পৃথিবীর সঙ্গে তার সমঝোতার অভাব ঘটে অহরহ। আর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু

হয়ে যায় তার ভয়ংকর হিস্টিরিয়া। অ্যাডিলেডের বিপরীত বিন্দুতে আছে পরিচারিকা মারিয়া। ভারী সুন্দর তার স্বভাব। মৃদুভাষী এবং সহমর্মী এই মহিলাটির সঙ্গে কিন্তু প্রথমদিকে ভাল করে আলাপও হয়নি আলেকজাণ্ডারের। অ্যাডিলেডকে সামাল দিতেই মনের দিক থেকে সব খরচ হয়ে যায় তার। আলেকজাণ্ডারের বেঁচে থাকার একমাত্র আশার আলো তার ছোট ছেলে—যাকে আদর করে ডাকা হয় 'লিটল ম্যান'। কিন্তু মোহান্ধ ভোগসর্বস্বতার অসহনীয় জীবনযাত্রা থেকে কী করে মুক্তি পাবে মানুষ? আসলে প্রাচুর্যের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া আজকের মানুষ বড্ড ভোগবিলাসী, বড্ড আরামপ্রিয়। পণ্যজগতের বাইরে কিছু পেতে হলে হৃদয় থেকে দিতে হয় অনেককিছু এটা স্বীকার করতে সে রাজি নয়। কিন্তু আলেকজাণ্ডার রাজি—এমনকী চরম আত্মদানেও। কেননা স্বার্থান্ধতার অসহনীয় চেহারা তার বেঁচে থাকা আর না থাকাকে সমান করে তুলেছে। কিংবা আসলে সে বেঁচেই নেই, চরম আত্মদানের ভেতর দিয়ে অন্তত বাঁচার একটা অর্থ সে খুঁজে পেতে চায়—যা পণ্যসর্বস্বতার "স্বাভাবিক" সমাজের কাছে শুধু 'অস্বাভাবিকতাই' নয় চূড়ান্ত পাগলামি।

অর্থাৎ 'সভ্যতার সংকট'। কিন্তু গোটা 'সভ্যতার সংকট'কে তো একটা ব্যক্তি মানুষের রোগমুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় না—তার বিশালতা ধরা পড়বে না তাহলে। অতএব আলেকজাণ্ডারের রোগমুক্তি নয়, (যা প্রথম খসড়ায় ছিল) গোটা সমাজ-সভ্যতার রোগমুক্তির জন্য চাই ব্যক্তি মানুষের আত্মদান। আর স্বার্থান্ধ সমাজের ক্যান্সারের তুলনায় আসল ছবিতে তাই এল ভয়ংকর এক বিধ্বংসী নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের কল্পনা। তার থেকে পালানোর পথ নেই কারুর। আলো নিভে যায়। রেডিও, টিভি বিকল হতে থাকে।

অ্যাডিলেডের হিস্টিরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিবেশ যেন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্তি কোথায়? সময়ের জটিল আবর্তে থমকে দাঁড়ান মানুষ প্রায়শই পথ খোঁজার জন্যে চলে যায় স্বপ্নের ভিতরে। মানুষের স্বপ্ন আর স্মৃতি অস্তিত্বের রঙ রূপ হৃদয় খুঁড়ে আবিষ্কার করতে চায়, সামনের জটিল সময়ের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে বলে। আলেকজাণ্ডারও স্বপ্ন দেখেছিল। ভয়ংকর সেই স্বপ্ন, যাতে ছিল অন্তিম বিপদের সংকেত। বিশাল এক চত্বর দিয়ে অসংখ্য ভয়ার্ত, প্রায় নগ্ন নরনারী ছুটে পালাচ্ছে অদ্ভুত জটিল কিন্তু মসৃণ গতিপথে। নিউক্লিয়ার হলোকাস্ট? উল্টে পড়ে আছে রঙ চটা পুরনো গাড়ির ধ্বংসাবশেষ—ছেঁড়া টায়ার। অন্ধ টেকনোলজির নির্জন পোড়ো জমিতে টপ্ টপ্ করে নোংরা জল পড়েই যাচ্ছে। শাদাকালোর আঁচড়ে

ক্যামেরায় আঁকা অদ্ভুত ভয়ংকর এই স্বপ্নদৃশ্য সিনেমার ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকে।

বিপদের আভাস পাওয়া গিয়েছিল আরো একবার যখন এক উড়ো জাহাজ বিকট গর্জনে কাঁপিয়ে দেয় ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র উল্টে যায়, দুধের জগ আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে আর পা পিছলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে অটো নামের ডাক পিয়ন। অটো এসেছিল আলেকজাণ্ডারের জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে। জন্মদিনের একটা অদ্ভুত উপহার এনেছিল—পুরনো ইউরোপের মানচিত্র যার সঙ্গে আসল মানচিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। রাজা রাজরাদের যুদ্ধ বিগ্রহে, অত্যাচারে বার বার ভাগ হয়েছে রক্তাপ্লুত নানা দেশের ছবি। স্বার্থ পরিচালিত সেই ভাগকে যেন অস্বীকার করেই এই কাল্পনিক মানচিত্র। শুধু মানচিত্র নয়। অদ্ভুত সব ঘটনাবলীরও অ্যালবাম রাখে অটো। তার সংগ্রহশালার অদ্ভুত গল্প আছে একটা। যুদ্ধের সময়ে মায়ের একমাত্র ছেলে মারা গিয়েছিল। ছেলেটার একমাত্র স্মৃতি ছিল একটা মাত্র ফটোগ্রাফ যা হারিয়ে যায়। অনেকবছর পরে মা গিয়েছে একটা স্টুডিওতে ছবি তুলতে তার বন্ধুকে উপহার দেবে বলে। কিন্তু ছবিটা যখন পাওয়া গেল, চমকে উঠল মা। এটাতো তার স্টুডিওতে তোলা ছবি নয়। ছবিতে উঁকি মারছে তার ছেলে, ঠিক যুদ্ধে যাওয়ার সময়কার ছবি। আর পাশে বসা মায়ের বয়স কমে গেছে অনেক। সেই একই সময়কার তরুণী মায়ের ছবি, যখন ছেলে যুদ্ধে গিয়েছিল।

স্মৃতি এবং স্বপ্নের এই মায়াবী জাদু বারে বারেই তারকোভস্কির নানা ছবিতে ঘুরে ফিরে আসে।

'নস্টালজিয়া'র নায়ক আন্দ্রেই, ইটালিতে গিয়েছে এক রাশিয়ান সঙ্গীত স্রষ্টার জীবন সম্পর্কিত গবেষণায়, যার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় ইটালিতে। সঙ্গিনী ইউজেনিয়াকে নিয়ে আন্দ্রেই গিয়েছিল এক তীর্থস্থানে, যেখানে নিঃসন্তান নারীরা সন্তান কামনায় প্রার্থনা করতে আসে ভার্জিন মেরির কাছে। চারজন মেয়ে পর্দা ঢাকা ভার্জিন মেরির ভারী মূর্তি বহন করে আনে। কিন্তু পর্দা খুলে যেতেই অবাক কাণ্ড। এক ঝাঁক পাখি ভার্জিন মেরির বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আকাশে ছড়িয়ে পড়তেই শাদা বরফের মতন তাদের পালক ঝরে ঝরে পড়ে। সেপিয়া রঙের এক স্বপ্নদৃশ্যে দেখা যায় আন্দ্রেই ওই বরফ ঝরে পড়ার মতন ঝরে পড়া শাদা পালক সযত্নে তুলে নিচ্ছে মাটি আর কাদা থেকে। স্বপ্নের ভিতরে ওই পাখি বা পালক ঘুরে ফিরে আসে। আরেকটা স্বপ্নদৃশ্যে

দেখা যায় শোবার ঘর, নারী ও পালঙ্ক, অন্যকোন জায়গার সুখস্মৃতি আর জানালার তাকে মরা পাখি।

হঠাৎ সেই পালঙ্ক স্থান পরিবর্তন করে। বর্ণহীন এক দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই পালঙ্কে শোয়া এক প্রসূতি, আন্দ্রেইর স্ত্রী অথবা মা। কিংবা ডমিনিকোর স্বপ্নের নিসর্গদৃশ্য তার জানলা খুলে ইটালির পাহাড় হয়ে বাইরে মিশে যায়, বা ছবির শেষ দিকে রুশ সঙ্গীতের তালে তালে স্বপ্নের সরোবরের কাছে দাঁড়ানো অন্যকোন জায়গার সুখস্মৃতি। আন্দ্রেইর কাঠের বাড়ি একটা ছোট্ট থিয়েটারের স্টেজের মতন হয়ে গিয়ে বিশাল ক্যাথিড্রালের ভগ্নাবশেষের ভিতর ঢুকে যায়। গীর্জার চত্বরে ঘাসের ওপর আন্দ্রেইর অস্থির পদক্ষেপ আর গীর্জার ভিতর সেণ্ট ক্যাথারিন এবং ঈশ্বরের দৈব কথোপকথনে জানা গেল সেণ্ট ক্যাথারিনের আকুল প্রার্থনা, মানুষের ভিতরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যেন উপলব্ধি ঘটে। ঈশ্বরের বাণী শোনা যায় 'মানুষকে তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে, নিজের সচেতনতায় আস্থা রেখে'।

তারকোভস্কির কাছে সময়ের ধারণা মানুষের স্মৃতি আর স্বপ্নের সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। কালপ্রবাহে মানুষের অস্তিত্বের অবলম্বন এই স্মৃতি। যা বর্তমান তা তো ক্ষণস্থায়ী। জলের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া নুড়ির চাঞ্চল্য যেমন অপসৃয়মান জলের তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই মুছে যায় তেমনি পলকা এবং অনির্দেশ্য এই ক্ষণস্থায়ী বর্তমান। কিন্তু যেই 'বর্তমান' অতীতে চলে যায়, কালপ্রবাহে তার ছাপ রেখে দিয়ে যায় মানুষের স্মৃতিতে—যাকে তারকোভস্কি বলেছেন 'ইমপ্রিণ্টেড টাইম' তখনই তার কালজয়ী ব্যাপ্তি ঘটে। স্মৃতির এই সঞ্চার, স্বপ্নের মধ্যেই তার তীব্রতম অভিনিবেশ, সময়প্রবাহকে করে তোলে গভীর অর্থপূর্ণ—যা সিনেমা ছাড়া অন্য কোন শিল্প মাধ্যমে এত পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। তাই স্মৃতি আর স্বপ্ন এত জরুরি তারকোভস্কির ছবিতে।

সময়প্রবাহে পাখা মেলে দেওয়া বাস্তবতার রঙ রূপ আর রহস্যকে ক্যামেরাবন্দী করাই সিনেমার মূল কাজ আর এইজন্যেই বাস্তবের সঙ্গে এমন নির্ভেজাল যোগসূত্র থাকে সিনেমার (প্রকৃত সিনেমার) যা অন্য কোন শিল্প মাধ্যমে নেই। সেইজন্যে সিনেমাকে তারকোভস্কি বলেছেন 'স্কাল্পটিং ইন টাইম'। কালপ্রবাহকে এমন করে বিষয়বস্তু করে তুলতে পারে না, মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না অন্য কোন শিল্পমাধ্যম।

সময়ঘটিত সিনেম্যাটিক ভাস্কর্যে ভয়ংকর জরুরি হয়ে দেখা দেয় সময়ের গতি

সম্পর্কিত ধারণা। সময়প্রবাহের ক্ষিপ্রতা-মন্থরতা, চাঞ্চল্য বা অলসতা। অনেকটা জলপ্রপাতের সঙ্গে তুলনীয় এই 'সময়প্রপাত' যা চলমান ছবির সূত্র ধরে বয়ে চলে। এখানে মুশকিল আছেঃ ভিন্ন স্থান কালের, ভিন্ন গতিসম্পন্ন বিভিন্ন সময়প্রবাহের একখাতে বয়ে যাওয়া। ছোট বড় নানারকম পাইপের জলপ্রবাহকে যেমন জলচাপের সামঞ্জস্য বজায় রেখে নির্দিষ্ট খাতে বইয়ে দেওয়ার সমস্যা আছে সেইরকমই সমস্যা অর্থপূর্ণ ভাবে 'সময়-প্রপাত'কে বহমান করে তোলা সিনেমার শিল্পকৃতিতে।

গতি সম্পর্কিত 'সময় ভাস্কর্যের' ভাল উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তারকোভস্কির অনেক ছবিতেই। অন্ততঃ তিনরকম সময়ের গতি নিয়ে কাজ করতে হয় চলচ্চিত্রকারকে : ঐতিহাসিক সময়ের গণ্ডী যার ভেতরে সংঘটিত হয়েছে চলচ্চিত্রের ঘটনা, প্রেক্ষাগৃহে বসে ছবি প্রদর্শনের সময়, আর সিনেমার 'ধারণাগত সময়' যা সিনেমার শিল্পকৃতির ওপর নির্ভর করে, যা বিভিন্ন শটের সময় দৈর্ঘ এবং ধারণাগতভাবে সময়ের যে বহমানতাকে সূচিত করা হচ্ছে বিভিন্ন শটের মাধ্যমে তার সম্পর্ক নির্দেশ করে।

'নস্টালজিয়া'তে নায়ক আন্দ্রেই জলশূন্য এক সুইমিং পুলে একটা জলন্ত মোমবাতি নিয়ে চলেছে ডমিনিকোর স্মৃতিতর্পণে। এই দৃশ্য দেখান হল প্রায় ততটা সময় ধরেই যতটা সময় বাস্তবে খরচ হতে পারে এর প্রকৃত কার্য-কলাপে। কিন্তু সিনেমায় তো পাঁচমিনিটের ঘটনা পাঁচমিনিটে দেখান হয়না—দেখানো হয় অনেক কম সময়ে। এখানে সময়ের দীর্ঘায়িত লয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এক নাটকীয়তা যা ছবির চূড়ান্ত দিকনির্ণয়ে সাহায্য করে। আসলে 'স্যাক্রিফাইসে'র এর আলেকজাণ্ডারের মতই ডমিনিকো এক পীড়িত ব্যক্তিত্ব, যে মানুষেরমুক্তির জন্য চূড়ান্ত আত্মদানে প্রস্তুত। মার্কাস অরেলিয়াসের অশ্বারোহী মূর্তির অনেক উঁচু পাটাতনে উঠে সে বক্তৃতা দিচ্ছিল ইতিহাসের গতিকে বদলে দেবার জন্য। কেননা ইতিহাসের একটা বিন্দু থেকে সব ভুল খাতে বয়ে গিয়েছে, জন্ম নিয়েছে স্বার্থসর্বস্ব মোহান্ধ এক সমাজ। কিন্তু এই উন্মাদ সমাজ ডমিনিকোকেই উল্টে উন্মাদ আখ্যা দেয় কারণ বিঠোফেন এবং শিলারের ওড টু জয় (অথবা ফ্রিডম) এর বাজনার তালে তালে সে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জেলে দেয়। বিশাল দর্শকবৃন্দ বিনা চিত্তচাঞ্চল্যে তা প্রত্যক্ষ করে, যেন কোন সার্কাস ঘটে যাচ্ছে। ডমিনিকোর কুকুরটা প্রভুর জন্যে চীৎকার করে কেঁদে-কেঁদে যায় এক নিষ্ফল জগতে।

ডমিনিকোর সঙ্গে আন্দ্রেই প্রথম থেকে নিজেকে একাত্ম ভেবে নিয়েছিল।

বাস্তব, স্বপ্ন, এবং ভ্রান্তির সীমারেখা প্রায়শই অবলুপ্ত হয়। বাস্তব সময় এবং ধারণাগত সময়ের প্রবাহ একাত্ম হয়ে পড়ে যখন আন্দ্রেইর হোটেল ঘরে হঠাৎ একটা বিশাল কুকুর (আসলে ডমিনিকোর কুকুর) তার বিছানার উপর উঠে বসে, যেন কতদিনের সঙ্গী। ডমিনিকোর এই কুকুরটাই প্রভুর আত্মবিসর্জনের সময়ে কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছিল। যেন একই অমোঘ নিয়তি ডমিনিকো আর আন্দ্রেইকে অনুসরণ করে চলেছে, আর তারই প্রকাশ ওই কুকুর মারফত। ডমিনিকোর আত্মত্যাগের পর পুরনো বাড়িতে যখন আন্দ্রেইর দীর্ঘ পদক্ষেপ ঘটছে নিঃশব্দে তখন হঠাৎ একটা পুরনো আলমারির পাল্লা খুলে যায়। পাল্লার ভেতরে আয়না। সেই আয়নায় আন্দ্রেই মুখ দেখতে গিয়ে দেখতে পায় ডমিনিকোর প্রতিচ্ছবি। আসলে অন্য এক সময়, অন্য এক দেশের স্মৃতিতে আন্দ্রেই প্রবলভাবে পীড়িত। তারকোভস্কির মতনই। নিজের দেশে আফ্রোসিয়াল মতাদর্শের ফেরিওয়ালাদের প্রবল অত্যাচারে তিনি আর ছবি করতে পারছেন না। তাঁর প্রথম ছবি 'ইভানের বাল্যকাল' থেকেই এই আক্রমণ চলে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে আত্মবলি দেওয়া এক বালক ইভানের গল্প নিয়ে এই ছবি। ছবিতে ছড়িয়ে আছে যুদ্ধ, বারুদের গন্ধ আর ভয়াবহতা। জঙ্গী জীবন এবং অবিরত লড়াই। কিন্তু সমস্ত লড়াই ছাপিয়ে বার বার ঘুরে ফিরে আসে ইভানের শৈশবের স্বপ্ন। তলহীন অনির্দেশ্য এক কুয়োর জলে কেঁপে কেঁপে ওঠে ইভান আর ইভানের মায়ের ছবি। কিংবা ইভানের বোন। সমুদ্রের তীরে রোদ মেখে ইভান আর বন্ধুদের আর তার বোনের হুড়োহুড়ি। কিংবা বৃষ্টি ধোওয়া একদিনে ইভান আর তার বোন খোলা গাড়িতে চলেছে। গাড়ি ভর্তি আপেল গাদাগাদি করে ঠাসা, চলমান গাড়ির থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিশাল প্রান্তরে একটা ঘোড়া কোথা থেকে হাজির হয়ে আপেলগুলো অল্প-অল্প চিবিয়ে ফেলে দিয়ে পা মাড়িয়ে চলে যায়। পরিত্যক্ত স্মৃতির মতনই ধু ধু প্রান্তর জুড়ে পড়ে থাকে অনেক আপেল, অর্ধভুক্ত ছড়ান, কাদা মাখা। জঙ্গী এবং কেজো বাস্তবতার ভিতরে কেন এত স্বপ্নের আমদানি তার জন্যেও তারকোভস্কিকে কম কথা শুনতে হয়নি। তারপরে তারকোভস্কি যখন 'আন্দ্রে রুবলভ' করলেন তখন তার 'অকারণ' ভায়োলেন্স নিয়েও অনেক কথা উঠল। কথা উঠল পাগান উৎসব দৃশ্যে প্রচ্ছন্ন যৌনতার প্রাবল্য নিয়ে। গালাগালি চরমে উঠল 'দর্পণ' (মিরর) ছবির সময়ে, কেননা সে ছবিটা ছিল মূলত আত্মজৈবনিক। এত আত্মপ্রেম সমাজবাদী যূথবদ্ধতার নীতিশাস্ত্রে

অপাংক্তেয়। অবশেষে তারকোভস্কি ইটালি চলে যান 'নস্টালজিয়া' ছবির জন্য। কিন্তু প্রবাসে তাঁর শান্তি ছিল না একমুহূর্তের জন্যেও। নিজের দেশের আর সময়ের স্মৃতি তাঁকে উদ্বেল করে তোলে। একইরকমভাবে স্মৃতিপীড়িত হয়ে পড়েছিলেন ছবির নায়কের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন সেই গর্চাকভ— ঠিক যেমন স্মৃতিপীড়িত ছিল ছবির নায়ক আন্দ্রেই (তারকোভস্কির নিজেরই যেন প্রতিরূপ সেই নায়ক)। অন্য স্থান এবং অন্য কালের এই স্মৃতি যেন আমৃত্যু এক গভীর অসুখ। সেই অসুখ গোটা সমাজকেও যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই স্মৃতি এবং স্বপ্নসমৃদ্ধ, সমান্তরাল বিভিন্ন সময়প্রবাহকে কখন দীর্ঘ বিলম্বিত কখন দ্রুত কখন বা স্বাভাবিক মন্থর লয়ে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে আর মিলিয়ে দিতে গিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই মুছে দেওয়া হয় মাঝে মাঝেই বাস্তব আর কল্পনার, স্বপ্নের আর স্মৃতির সীমারেখা, যদিও টেকনিকালার এবং সেপিয়া রং এর ব্যঞ্জনায় আলাদা করা হয় বর্তমানের বাস্তব এবং অন্য স্থান—অন্য কালের উন্মেষকে। সময়ের গতিপ্রবাহের এই আশ্চর্য অর্কেস্ট্রেশন এক চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে যায় যখন আন্দ্রেই ডমিনিকোর স্মৃতি তর্পণে মোমবাতির আলো আড়াল করে এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে মরা সুইমিংপুলের ভিতরে। অনেকটা একইরকম যাত্রার কল্পনা আছে 'স্যাক্রিফাইসে'। অটো যখন আলেকজাণ্ডারকে বলল, চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আলেকজাণ্ডারকে মারিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে রাত্রিবাস করতে হবে। তার আগে আলেকজাণ্ডার হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য। কী ভয়ংকর সেই ধ্বংসের কল্পনা। জলাশয়ে জল থাকবে না, আকাশে পাখি থাকবে না, গাছ থাকবে না, ফুল থাকবে না। সমস্ত প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মৃত্যুর শুধু জান্তব ভীতিতেই কেঁপে কেঁপে ওঠা নয়, মানুষের এবং জীবনের বংশধারা রক্ষার, মানুষের যাবতীয় স্মৃতি, কবিতা আর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবার উদগ্র আকাঙ্খায় ঈশ্বরের কাছে সমস্তকিছু সমর্পণ করতে চায় সে। মৌনব্রত অবলম্বনের প্রতিজ্ঞা করে আলেকজাণ্ডার (কেননা কথার মূল্য হারিয়ে গেছে অনেক আগেই)। শুধু তাই নয়, তার সমস্ত পার্থিব সম্পদ, সুখ, বাড়িঘর এমনকী নিজের আদরের সংসার ত্যাগ করতেও প্রস্তুত আলেকজাণ্ডার। এরপর অটোর কথামতো মারিয়ার বাড়িতে তার নৈশযাত্রা। সময়কে দীর্ঘায়িত লয়ে বাঁধা হয় এইখানে। জলকাদা মাড়িয়ে শংকিত কল্পিত চিত্তে আলেকজাণ্ডারের দীর্ঘ যাত্রা দীর্ঘতর হয়। অবশেষে মারিয়ার বাড়ি পৌঁছয় এবং আত্মসমর্পণ করে।

শব্দের অপলাপের প্রসঙ্গ আগেই তোলা হয়েছিল ছবিতে। মানুষের যে অবিরত নির্মাণকার্য চলে তার মননে কিংবা ভাষার জগতে তা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিশুদ্ধ সংযোগ হারিয়ে ফেলে। মানুষের নির্মিত জগতে, বোধ এবং বুদ্ধির সাজান ইমারতে প্রকৃতির চেহারা বিকারগ্রস্ত হয়ে ধরা পড়ে এর অনিবার্য ট্র্যাজেডিতে। আলেকজাণ্ডারও তাই মারিয়ার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ মারফত তার নির্মিত জগতের, সাজান ইমারতের অবিনির্মাণ প্রার্থনা করে। মা'র মৃত্যুর সময়কার এক অদ্ভুত স্মৃতির উন্মেষ ঘটে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে আলেকজাণ্ডার মা'র কাছে বেড়াতে গিয়ে দেখল বাড়ির বাগানটা কেমন অগোছাল। আগাছা ভর্তি। সাতদিন দিনরাত পরিশ্রম করে যখন সাজান বাগান নির্মিত হল আলেকজাণ্ডারের কোদাল বেলচার প্রবল প্রহারে তখন দেখা গেল যত্নরচিত কিন্তু প্রাণহীন, বর্ণাধিক্যের বর্ণহীন, স্থবির একমাঠ বৃক্ষসজ্জা— যেন গোটা বাগানটার অপমৃত্যু ঘটেছে নিষ্ঠুর প্রহারে। ঠিক যেমন হয়েছিল ছোটবেলায় আলেকজাণ্ডারের বোনের চুল কাটার ব্যাপারে। ভারী সুন্দর চুল ছিল তার। কিন্তু অনেক যত্নে ফ্যাশন দুরন্ত উপায়ে যখন তার চুল ছাঁটা হল, বাবা কেঁদে আকুল। মেয়ের সুন্দর চুলের গোছা ফ্যাশনের নির্মিত সজ্জার প্রাবল্যে শেষ হয়ে গেছে। গভীর সহমর্মিতায় মারিয়া যখন আলেকজাণ্ডারকে গ্রহণ করে তখন হঠাৎ যেন সময়ের ঘড়ি থমকে দাঁড়ায়। শরীর সমর্পণের এক আশ্চর্যদৃশ্যে দেখা যায় বিছানার অনেক ওপরে শূন্যের মধ্যে মারিয়ার শরীরে আশ্রয় নেওয়া আলেকজাণ্ডারের শরীর বৃত্তাকারে মসৃণ গতিতে ঘুরে চলছে আর সেই নিউক্লিয়ার হলোকাস্টের পূর্বতন স্বপ্নদৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই ভোগস্বর্বস্ব প্রযুক্তির পরিত্যক্ত প্রাঙ্গণে ছুটে চলা অনেক নগ্ন শরীর। যেন পৃথিবীর শেষ আর তাইতো সময়ের ঘড়ি থমকে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে ডস্টয়েভস্কি থেকে লাগসই উদ্ধৃতি আছে যা তারকোভস্কি ব্যবহার করেছেন অন্য এক আলোচনা-ক্ষেত্রে। 'দি পজেসড্' উপন্যাসে স্তাভরোগিন বলছে "চূড়ান্ত সর্বনাশের মুহূর্তে (অ্যাপোক্যালিপ্স) 'সময়' আর থাকবে না—দেবদূতেরা বলেছেন" কিরিলভ বলে, "ঠিক কথা। সমস্ত মানবজাতি যখন 'সুখ' খুঁজে পাবে তখন আর 'সময়' থাকবে না কেননা 'সময়ের' প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না।"

স্তাভরোগিন : তাহলে 'সময়' কে কোথায় রাখা হবে ?

কিরিলভ : কোথাও রাখা হবে না। 'সময়' কি কোন বস্তু ? 'সময়' একটা 'ধারণা' মানুষের মনের মধ্যেই তার মৃত্যু হবে।

সময়ের জাদুকর তারকোভস্কি তাই কখন সময়প্রবাহকে স্তব্ধ করে কখন চঞ্চল

মুখর করে, কখন মন্থর দীর্ঘায়িত করে আমাদের স্মৃতি-স্বপ্ন-কবিতার আশ্চর্য উন্মেষ ঘটিয়ে অস্তিত্বের গভীরে চলে যান। হৃদয়-মস্তিষ্কপ্রাবী, ব্যাপক এক অর্থবহ সিনেম্যাটিক উপায়ে প্রকৃত সিনেমা স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠা পায়। সময়ের এই ভাস্কর্য ভিন্নতর এক অসাধারণ ছকে সঞ্চারিত হয় 'আন্দ্রে রুবলভ' ছবিতে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত আইকন পেইন্টারকে নিয়ে তোলা এই ছবি তারকোভস্কির প্রিয়, ধারাবর্ণনা বা ক্রনিক্‌ল এর ঢঙে পরিবেশিত। সত্যের সন্ধানে আন্দ্রে রুবলভের যাত্রা স্থানকালের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। প্রতিতুলনায় অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় বুহুএলের 'নাজারিন'। কিন্তু নাজারিনে কুইকজোটিক ব্যঙ্গের মাত্রা খুবই প্রকট। এখানেও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আভাস আছে। প্রথম দৃশ্যেই এক সরলমতি কৃষক খোলা বেলুনে করে আকাশে উড়তে চায়। উড়তে উড়তে দেখে নিতে চায় অনেক নীচের পৃথিবীর রূপ—একমুঠোয় ধরতে চায় নীচের জগৎ আর জীবন, যেন এক বিশ্ববীক্ষার অন্বেষণ, কী বিদ্‌ঘুটে উপায়ে। কিংবা বিদ্‌ঘুটে সেই 'সঙ'-এর লাগামছাড়া ক্যারিকেচার—সেখানে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য রুবলভ ও তার সঙ্গীসাথীরা হাজির হয়। ধর্মীয় অনুশাসনের গন্ডীর জগতের কাছে সঙ-এর আতিশয্য যেন এক রূঢ় প্রতিবাদ, তথাকথিত শৃঙ্খলা এবং ভব্যতাকে যা চ্যালেঞ্জ জানায় প্রাকৃত বদরসিকতার আতিশয্যে। আর এই আতিশয্যের জন্যেই গ্রেপ্তার হতে হয় ওই সঙ-কে—তাকে নির্দয় প্রহার করতে-করতে অন্ধ কুঠুরিতে নিয়ে যায় সৈন্যরা। কিন্তু অশরীরী ঈশ্বরপ্রেমী রুবলভকে চরম যন্ত্রণা ও বীভৎস অত্যাচারের নরক দর্শন করতে হয়। শরীরী প্রেমের এক উৎসবের বিকট সংঘাত, শরীরী পৃথিবীর সত্য অন্বেষাকে নতুন চেহারায় হাজির করে। অশরীরী থেকে শরীরী জগতের অস্তিত্বের শিকড়ে পৌছনর জন্য তাকে যে কাঁটার মুকুট তুলে নিতে হয় তার পদ্ধতি বর্ণনায় এমন এক সিনেম্যাটিক ছক ব্যবহার করা হয় বইয়ের অনুচ্ছেদভাগের মতন যেখানে সময়ের তাল-লয় বিশেষ মাত্রায়, বিশেষ ছন্দে বাঁধা—যার ফলশ্রুতিতে রুবলভের সত্যদর্শন অদ্ভুত তাৎপর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্যাশনের তীব্র শারীরিক চেহারা সেখানে এক নতুন বোধের সঞ্চার ঘটায়, নতুন মাত্রায়। ধরা যাক পাগান প্রেমের সেই উৎসব যা রুবলভের যাত্রাপথে দেখা দিল। সেন্ট জনের নৈশ উৎসবে পাগানরা লাগামছাড়া শারীরিক প্রেমে রত খোলা আকাশের তলায়। সেখানে অনেক মশাল জ্বলে উঠেছে। প্রেমের এই 'বেহায়াপনা' রুবলভের গোঁড়া চার্চের রুচিবোধে ভয়ংকর নীতিবিগর্হিত। তাই এই উৎসবের প্রতিবাদ করতে যায় রুবলভ, ফলে প্রচণ্ড প্রহার। শুধু প্রহারই নয় তাকে একটা ক্রশের সঙ্গে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

রুবলভ প্রতিবাদ জানায়। ধর্মগ্রন্থের বর্ণনাই যদি সত্যি হয় তাহলে মাথা নীচে আর পা ওপরে করে ঝুলিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। এভাবে ঝোলানো শুধু অনুচিত নয়, নিতান্ত ব্লাসফেমি। এক সুন্দরী মায়াবিনী ওই অবস্থাতেই রুবলভকে আদর করতে থাকে আর প্রচণ্ড শারীরিক প্রেমের আহ্বান জানায়। রুবলভের তত্ত্ব কথায় বিরক্ত হয়ে মেয়েটি বলে 'আরে বোকা, উল্টো করে ঝুলতে চেয়েছিলে কেন? ওতে তো ভয়ংকর যন্ত্রণা হত।' অবশেষে মেয়েটিই রুবলভকে মুক্ত করে, কিন্তু শারীরিক প্রেমের মতো ভয়ংকর পাপের প্রস্তাব কিছুতেই মানতে পারে না রুবলভ। এরপর দীর্ঘায়ত এই প্রেমের উৎসবের দৃশ্যে দেখা যায় নগ্ন ওই মায়াবিনীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সৈন্যদের ছুটোছুটি আর মেয়েটি জলের মধ্যে দিয়ে সাঁতরে পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে মাঝনদীতে সেই নৌকোর ওপর আশ্রয় নিতে চাইছে যেখানে রুবলভ রয়েছে। প্রচণ্ড অনীহায় রুবলভ শুধু নিজের চোখই বন্ধ করে না, অন্যদেরও চোখ বন্ধ করতে হুকুম দেয়। দীর্ঘলয়ের কালপ্রবাহে এইরকম ঘটনাপ্রবাহ ডানা মেলে দেয়— সময়প্রবাহের এই সিনেম্যাটিক বহমানতা এমন পর্দায়, এমন সুরে বাঁধা হয় যে ঘটনার নিজস্ব কাল অতিক্রম করে রুবলভের অশরীরী জগত খান খান হয়ে ভেঙে যেতে চায়। এমনই সময়প্রবাহ পরিকল্পনায় বাঁধা হয় তাতার আক্রমণের নারকীয় দৃশ্যাবলী যা শরীরী জগতের সত্যঅন্বেষণে রুবলভের অস্তিত্ব নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেয়। অবশেষে এক জড়বুদ্ধি মেয়েকে বাঁচানোর জন্য এক তাতার সৈন্যকে হত্যা করতে বাধ্য হয় রুবলভ। দারুণ আক্ষেপে তার মন ভরে যায়। স্যাক্রিফাইসের এর আলেকজাণ্ডারের মতোই অবশেষ সে মৌনব্রত অবলম্বন করতে চায়। এত যন্ত্রণার পৃথিবীতে মানুষের মুক্তির জন্য সে চূড়ান্ত আত্মদানের জন্যে প্রস্তুত হয়। কিন্তু মুক্তির রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল অন্যভাবে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত রাশিয়ায় পুনর্নির্মাণের জন্য তখন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এক ধাতুশিল্পীও চলেছে একটা দলের মধ্যে কোন এক গীর্জার বিশাল ঘণ্টা তৈরি করতে হবে। তার বাবা মারা গিয়েছে কিছুদিন আগে। মৃত্যুকালে নাকি বাবা তার কাছে রেখে গিয়েছে ঘণ্টা বানাবার মন্ত্রগুপ্তি।

বিশাল কর্মযজ্ঞের শেষে যখন ঘণ্টা তৈরি হয়ে প্রথম বেজে উঠল, ধাতুশিল্পী ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বাবা তাকে কোন মন্ত্রগুপ্তিই দিয়ে যায় নি মৃত্যুর সময়। যা ঘটল সবই তাকে কাজের ভেতর দিয়ে আবিষ্কার করে নিতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্ম ঘটে গেল রুবলভের। নিজের থেকেই মৌনব্রত ভেঙে সে ছেলেটিকে বলে উঠল, আবার আমি আইকন চিত্রায়ণ শুরু করব।

তুমি গীর্জায় গীর্জায় ঘণ্টা বানাবে আর আমি ছবি এঁকে যাব। দুই প্রজন্মের শিল্পীসত্তার আশ্চর্য মিলন ঘটল আর এইবার শাদাকালো ছবির দাঁড়ি টেনে রঙীন চিত্রে একটার পর একটা ভেসে উঠল রুবলভের নতুন নতুন সৃষ্টি। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। একপাল ঘোড়া শুধু ভিজেই যাচ্ছে।

সময়ের গতিপ্রবাহের আরেক অর্কেস্ট্রেশন 'সোলারিস' ছবিতে। সেখানে এক মহাকাশ যানে অনির্দেশ্য যাত্রা শুরু হয়েছে সোলারিস নক্ষত্রের দিকে। ওই নক্ষত্রে নাকি এক আদিম প্রাণসমুদ্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যখনই তার কাছাকাছি মহাকাশযান এসে পড়ে, নানারকম অলৌকিক ঘটনাবলী শুরু হয়ে যায়। মহাকাশযাত্রীরা ইচ্ছেমতন তাদের অতীত সময়ে ফিরে যায়। তাদের ইচ্ছাপূরণ ঘটে। এখানে সময় সম্বন্ধে একটা 'প্যারাবল' রচিত হয়েছে সিনেম্যাটিক পদ্ধতিতে—তার মধ্যে সিনেমার চরিত্রের একটা দিকও নিহিত আছে। তারকোভস্কির মতে সিনেমার অসামান্য বৈশিষ্ট্য হল সেই 'সময়কে ধরে রাখা যে সময় আসলে পুনরাবৃত্তিতে অক্ষম। সময়-সমুদ্রে ভেসে চলা ঘটনা তখনই তার প্রকৃত সিনেম্যাটিক রূপ গ্রহণ করে যখন সময়ের মধ্যে সেই ঘটনার অস্তিত্বই শুধু টিকে থাকে না, 'সময়' ও বেঁচে থাকে ওই ঘটনার ভেতরে। তাই সিনেম্যাটিক চিত্রকল্পে পুনরাবৃত্তিতে অক্ষম 'সময়' পুনরাবৃত্ত হয়। সেই 'সময়' নতুন করে বহমান হয় সিনেমার পর্দায় আর তাহলে নিশ্চয়ই বর্তমানের গণ্ডীতে বহমান অতীত 'সময় মানুষের চেষ্টায় নতুন রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে। এমনকি ইচ্ছাপূরণের উপায় হিসেবে তার পুরনো রূপ আমূল বদলে ফেলতে পারে?

তাই সোলারিসের নায়কের ইচ্ছাপূরণের জন্য তার মৃত স্ত্রী ফিরে আসে। তাদের পুরনো স্মৃতি আর স্বপ্ন নতুন করে সংঘটিত হয় বর্তমানের গণ্ডীতে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। অতীতের মতনই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মারা যায় নায়কের স্ত্রী (নাতালিয়া বন্দেরচুক)।

আর এই সময় দর্শন, সময়-স্মৃতির দ্বার পরিগ্রহণে তারকোভস্কির ছবিতে অনুসৃত হয় এমন সব শব্দ-দৃশ্যাবলী যা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা মানুষের সভ্যতার এক বিশাল প্রাসাদ গড়ে তোলে সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করে—যাকে মার্শাল প্রুস্ত বলেছিলেন 'ভাস্ট এডিফিস অব মেমোরিজ' যে কথার পুনরুক্তি তারকোভস্কির ছবিতে এবং লেখায় ঘুরে ফিরে আসে। কিন্তু সময়বদ্ধ, স্মৃতিপীড়িত এই অসহনীয় যুগযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কোথায়! এই খানেই সিনেমার বিষয়ান্তর ঘটে। গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসচালিত একটা মন আকুল আগ্রহে পরম এক বিশ্বাসের অপেক্ষায় থাকে, যা মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ

দেবে। কিন্তু পথনির্দেশ কি পাওয়া যায়? যা পাওয়া যায় তা হল এক আত্মধ্বংসী, মর্ষকামী, আত্মদানের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। পৃথিবীর মুক্তি নেই অন্যকিছুতেই। সোনা ফলানো যে মানবজমিন পতিতই হয়ে রইল, বিশ্বাসের আগুনে সর্বস্ব আহুতি না পেলে, খাঁটি সোনার ফলন ফলবে না সেখানে—বন্ধ্যাই থেকে যাবে বিশাল সম্ভাবনাময় এই মানবজমিন।

তাই আন্দ্রে রুবলভের আত্মধ্বংসী কামনা। নস্টালজিয়ার ডমিনিকো আর আন্দ্রেই এর আত্মাহুতি। স্যাক্রিফাইসের আলেকজাণ্ডারের আত্মদান।

ঈশ্বরচিন্তার এক পরমবিশ্বাস, একনিষ্ঠ খৃষ্টান ধারনা এখানে অন্তর্লীন হয়ে আছে। তারকোভস্কির বাবা ছিলেন রাশিয়ার এক বিখ্যাত কবি—যাঁর কবিতা বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে তারকোভস্কির ছবিতে। সেই বাবার সূত্রেই একদিন আলাপ হয়েছিল বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী লাণ্ডাউ এর সঙ্গে। তারকোভস্কি তখন বালকমাত্র। লাণ্ডাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আচ্ছা ভগবান কি আছেন?'

লাণ্ডাউ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছিলেন 'আমার মনে হয় ঈশ্বর আছেন।'

আসলে ঈশ্বর আছেন কি নেই তার থেকেও জরুরি হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা, ঈশ্বরের ধারণা। দুর্জয় পরিবেশ ও তার প্রকৃতিতে অপদস্থ, অসহায় মানুষ আজ এত ওপরে উঠে এসেছে তার একটা বিরাট আত্মিক অবলম্বন ঈশ্বরের ধারণায় যা দিয়ে বিপুল এই জীবন আর জগৎকে নিজের কল্পনার চৌহদ্দিতে ধরে নেবার স্পর্ধা পায় মানুষ।

মানুষের স্বপ্ন-স্মৃতি-কবিতার বংশধারা রক্ষার, প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ-আনন্দ-যন্ত্রণা, আশা-নিরাশার কালচক্র অতিক্রান্ত প্রবহমানতার জন্য, পৃথিবীর মানুষের অমরত্বের সন্ধানে ঈশ্বরের এই মানুষী পরিকল্পনা। গভীর আধ্যাত্মিকতায় লিপ্ত তারকোভস্কি মনে করতেন আধ্যাত্মিক মাত্রা বাদ দিয়ে মানুষের 'স্মৃতির' অস্তিত্ব কল্পনাতেও ভাবা যায় না। 'সময়' ছাড়া 'স্মৃতি' হয় না কিন্তু শুধু সময়ের পটভূমিতে 'স্মৃতি'-কে ব্যাখ্যা করা যায় না কখন। কিন্তু মানুষের মনে 'স্মৃতি' এনে দেয় গভীর অতৃপ্তি। কখন কখন এই অতৃপ্তি এক আমৃত্যু অসুখের মতন হয়ে দাঁড়ায়। অন্য সময়, অন্য স্থানের স্মৃতিকে কালাতিক্রান্ত, শাশ্বত করে রাখবার প্রয়াসে সময়ের ঘড়ি স্তব্ধ করে দেবার অসম্ভব প্রয়াস চলে। যেমন চলেছিল ডমিনিকোর কল্পনায়। একটা ছোট্ট বাড়িতে কুড়ি বছর ধরে তার পরিবারকে বন্ধ করে রেখেছিল ডমিনিকো। তার বাইরের জগৎ

যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ডমিনিকোর আত্মাহুতির পর পুলিশ যখন তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করল, ডমিনিকোর ছোট ছেলে হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—এই কি পৃথিবীর শেষ? কোথায় যেন মিল আছে সার্ত্র এর নাটক 'কনডেম্‌ড অ্যাট আনাতোলি'র সঙ্গে। অবশ্যই সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে ও অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে সার্ত্রএর নায়ক, ফ্যাসিস্টদের সংযোগী গণশত্রুকে বছরের পর বছর একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রেখেছিল তার বোন। যেন সেইখানেই পৃথিবীর শেষ। ফ্যাসিস্ট নিপীড়ণের হলোকাস্ট—বাইরের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় ছেলেরা ভিখিরি আর মেয়েরা বেশ্যা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রকম এক কাল্পনিক জগতের বিভীষিকায় ছেলেটি অনুতাপে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যাক—এই ছিল বোনের আশা।

আসলে কিন্তু বাইরে তখন ঝলমল করছে আলো আর প্রাচুর্য। যুদ্ধের স্মৃতি কোথায় মুছে গিয়েছে—মুছে গিয়েছে যুদ্ধ অপরাধের পাপপুণ্যবোধ। যুদ্ধোত্তর প্রাচুর্যে গা ভাসিয়ে হাসি আর ফুর্তির প্রবল জোয়ার শুরু হয়েছে বাইরের পৃথিবীতে।

তাই তারকোভস্কির কল্পনায় স্মৃতিবিগর্হিত, ভোগান্ধ এই সমাজের মুক্তির জন্য, মানুষের মহিমা নিয়ে মানুষের বংশগতি রক্ষার জন্য, নতুন করে জীবনের মুক্তিকামী স্মৃতি আর স্বপ্নের উন্মেষ ঘটানোর জন্য এক মর্মকামী আত্মনাশের ইচ্ছা উগ্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আর এই আত্মপ্রকাশ এত ব্যাপ্ত এত তীব্র যে দীর্ঘ ছ' মিনিট লেগেছিল স্যাক্রিফাইসের আলেকজাণ্ডারের বাড়ি আত্মাহুতির আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যেতে। সিনেমার ইতিহাসের দীর্ঘতম, অবিস্মরণীয় এই শটে দেখা যায় আলেকজাণ্ডার নিজের হাতে তার বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। কেননা মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মারিয়ার কাছে শরীর সমর্পণের আগে, ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনায় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল,আণবিক ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পেলে সে তার সুখ, সংসার আর আশ্রয়—সমস্ত কিছু আত্মাহুতি দেবে। তাই বাড়ির অন্য সবাই যখন পরদিন সকাল বেলার প্রাতরাশের পর প্রাতঃভ্রমণে রত তখন আলেকজাণ্ডার বাড়ির আসবাবপত্র জড়ো করে, বাড়ির ভেতরেই, উপরের বারান্দায় আগুন ধরিয়ে দেয়। বীভৎস সেই আগুনের লেলিহান শিখা একটু একটু করে বাড়িটা গ্রাস করতে থাকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হয়। ওপরের ঘরে তখন স্টিরিও রেকর্ডারে বেজে যাচ্ছিল অন্তিম স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত রিকোয়েম। সে বাজনাও থেমে যায়। আগুনের কালো ধোঁয়া ওপরে উঠতে থাকে আর আণবিক সর্বনাশের কল্পদৃশ্যের মতোই কমলা আর লাল আগুনের শিখা তার লকলকে

জিভে অন্তিম সর্বনাশের বিকট মুখ যেন চেটে চেটে উপভোগ করতে থাকে। বিকট আওয়াজে ধসে পড়তে থাকে দরজা, জানলা আর দেওয়াল। এই কাল্পনিক আত্মদানের মতোই সত্যি-সত্যি সিনেমার আয়োজনের আত্মাহুতিও ঘটতে চলেছিল শটিং এর সময়।

আগুনে বাড়িটা পুড়ে যেতে-যেতে হঠাৎ ক্যামেরা বিকল হয়ে পড়েছিল। ছবি তোলবার পর দেখা গেল শটটা আদৌ ওঠেই নি। দীর্ঘ চারমাসের হাড় ভাঙা পরিশ্রম নিষ্ফল হয়ে গেল। কিন্তু তারপর আশ্চর্যজনক ভাবে প্রবল নিষ্ঠা আর অসহনীয় পরিশ্রমে আবার গড়ে তোলা হল সেই বাড়ি, হুবহু এক, নিখুঁত। এবার দুটো ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছিল। ঠিক ঠিক দৃশ্য গ্রহণ শেষ হলে আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল দলের সবাই। গোটা দলটা তখন উৎসবে মেতে উঠেছে। পাগলের মতো আলিঙ্গন করছে একজন আরেকজনকে। সিনেমার নাটকের সমান্তরাল এ এক জীবনের নাটক।

নাটকীয়তা সম্পর্কে তারকোভস্কির কিছু নিজস্ব মন্তব্য আছে, যা তাঁর স্যাক্রিফাইসের প্রতিতুলনায় অন্যান্য ছবি মিলিয়ে দেখলে অর্থবহ হয়ে ওঠে।

সিনেম্যাটিক পদ্ধতিতে সময়প্রবাহের যে গতিপরিবর্তন নাটকীয়তার মাত্রা এনে দেয় তার বিশেষ উদাহরণ হিসেবে স্যাক্রিফাইসের উল্লেখ আছে তারকোভস্কির লেখায়। সেখানে বিভিন্ন চরিত্রের কথায় এবং কাজে নাটকীয়তার বিস্ফোরণ বিন্দু স্পর্শ করে যাচ্ছে বারে বারে। কিন্তু মানব সভ্যতার অন্তিম সর্বনাশের প্রান্তভূমিতে, বেদনাক্লিষ্ট আলেকজাণ্ডারের স্মৃতি আর স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে জীবনের 'পুনর্জন্মের' চেষ্টায়, কিংবা অমোঘ প্রকৃতির মতোই এক রহস্যময়ী নারীর কাছে শরীর-মন সমর্পণের আশ্চর্য সুখের পর সর্বস্ব আত্মাহুতির অদ্ভুত পরিতৃপ্তিতে এবং সর্বোপরি সেই আশ্চর্য নির্জন প্রান্তভূমির অদ্ভুত শব্দ এবং সুরের গায়ে কাঁটা দেওয়া আবর্তনে (সেই শব্দ পরিমণ্ডলে আছে মেষপালক কিংবা রাখালের বিষণ্ণ ডাক, কোন অজানা লোকসংগীতের সুরবাদ্যের ছেঁড়া টুকরো, বাঁশির অসমাপ্ত টান···) ছবির নাটকীয় গতিপ্রবাহে এক আশ্চর্য কাব্যিকতার মাত্রা সংযোজন হয়। তুলনায় ততখানি 'নাটকীয়' নয় তাঁর আগের ছবি 'নস্টালজিয়া'। সেখানে মাত্র দুটি জায়গায় নাটকীয়তার উন্মেষ আছে—ডমিনিকোর গায়ে আগুন জ্বালিয়ে আত্মাহুতির দৃশ্যে এবং যেখানে ডমিনিকোর স্মৃতিতর্পণে আন্দ্রেই একটা জলন্ত মোমবাতির শিখা বাতাসের ঝাপ্টা বাঁচিয়ে হাতের আড়ালে—কখন কোটের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বার বার তিনবার সেই মোমবাতি নিভে যায় এবং নতুন করে তার যাত্রা শুরু করতে হয়

মোমবাতি জালিয়ে। অবশেষে সক্ষম হয় জলন্ত মোমবাতির স্মৃতিতর্পণে এবং এই তর্পণের শেষেই আমৃত্যু স্মৃতিতাড়িত, স্বপ্নপীড়িত তার গভীর অসুখ তার মৃত্যু ডেকে আনে সেইখানেই।

আন্দ্রে রুবলভের "নাটকীয়তা" আবার সম্পূর্ণ অন্য মাত্রায় বাঁধা। সেখানে কোন চূড়ান্ত নাটকীয়তার অন্তিম বিন্দু নয়, ঘটনাপরম্পরা এবং সময় প্রবাহের সংঘাতে যে 'নাটকীয়তা' গড়ে উঠেছে, সিনেমার পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদান্তরে, তার চেহারা বিশাল পর্বতমালার মতো—অসংখ্য পাহাড়ের অসংখ্য শীর্ষবিন্দুর বিশাল পরিব্যাপ্তিতে। এই বিশাল ব্যাপ্তির পরিমণ্ডলে রুবলভের যখন চূড়ান্ত উপলব্ধি ঘটল—মৌনব্রত ভঙ্গ করে যখন সে ঠিক করল আবার আইকন পেন্টিং শুরু করবে (তার সঙ্গে থাকবে নতুন প্রজন্মের সেই ধাতুশিল্পী, গীর্জার ঘণ্টা বানাবার জন্য)—তখন কিন্তু তা নাটকীয়তার ঊর্ধ্বে চলে যায়। দৃশ্য বা শব্দের প্রকরণগত নাটকীয়তা অতিক্রান্ত, কালাতিক্রান্ত এক উপলব্ধির সঞ্চার ঘটে যা শুধু সিনেমাতেই সম্ভব, নাটক বা অন্য শিল্প মাধ্যমে নয়। সোলারিসে আবার সেই রকম নাটকীয়তা নেই। সেখানে সিনেমার শরীর গড়ে উঠেছে এক অদ্ভুত পরিবেশ বিষণ্ণতায়—তার কেন্দ্রে আছে সময়ের সিঁড়ি বেয়ে চলা এক স্বপ্নযাত্রা যেখানে মানুষের দুঃসহ স্মৃতি বহন করে আনে সময়কে উল্টে দেবার স্পর্ধা এবং একই সঙ্গে মানুষের অমোঘ ট্র্যাজেডি। কোথায় যেন মানসিকতার মিল আছে তারকোভস্কির সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের, যদিও সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশ এবং অন্য প্রেক্ষাপটে ঋত্বিকের ছবি তৈরি হয়েছে—প্রসঙ্গ ও বিষয়েরও খুব মিল নেই। কিন্তু আমার কাছে একটা অদ্ভুত আত্মিক মিল আত্মপ্রকাশ করে ঋত্বিকের সুবর্ণ-রেখায় ঈশ্বরের দুঃস্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে আত্মদর্শনের আর শহরের নরকদর্শনের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের আত্মদর্শনের আর আত্মাহুতির পরিকল্পনায়।

'তুমিও দেখি শূন্যে দোদুল্যমান···দুর্ভিক্ষ ছাখে নাই, দাঙ্গা ছাখে নাই··· অ্যাটম জানে না। ইহারাই অমৃতের সন্তান।' ঋত্বিকের এই সামাজিক হুলোকাস্টের বর্ণনায় কোথায় যেন মিল আছে স্যাক্রিফাইসে আলেকজাণ্ডারের হলোকাস্টের। কিংবা, আনন্দ-যন্ত্রণার সিঁড়ি বেয়ে তিতাস এ একটি জনগোষ্ঠীর বেদনাদায়ক উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আন্দ্রে রুবলভের নতুন জীবনের উন্মেষে। আক্ষরিক মিল খোঁজা বৃথা এবং হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোথায় যেন দুই শিল্পীর দুই ধরনের সৃষ্টির টুকরো টুকরো রেশ এক তুলনীয় মানসিকতার আভাস দেয়। বিশেষ করে পাগান প্রেমের উৎসব দৃশ্যে যখন নৌকো করে রুবলভরা চলে যাচ্ছে আর সাঁতরে

পালাচ্ছে সেই রহস্যময়ী মেয়েটি সৈনিকদের হাত থেকে—সে রুবলভের নৌকোতেই উঠতে চায়। এই দৃশ্যটি আমার মনে হয়েছে তিতাসের বাইচ খেলার দৃশ্য এবং নদীকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর তীব্র প্যাশন সমৃদ্ধ উত্থান-পতনের বর্ণনার সঙ্গে কোথায় যেন আত্মিক ভাবে জড়িয়ে আছে।

অবশ্যই ঋত্বিকের মানসিক ট্র্যাডিশন ভিন্নতর। তাই স্বর্ণরেখায় শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর এক শিশুর হাত ধরে অমৃতের সন্ধানে যায়, আর স্যাক্রিফাইসে আলেকজাণ্ডার আত্মাহুতির ভেতরেই অমৃতের সন্ধান চায়। আলেকজাণ্ডারের বাড়ি যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তখন ছুটে আসে তার স্ত্রী-কন্যা আর পারিবারিক ডাক্তার। মারিয়াও কাজে যোগ দিতে এসে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য অনুধাবন করে। কিছুতেই কিছু বলবে না আলেকজাণ্ডার। কেননা 'শব্দের' প্রতি আস্থাহীনতায় সে মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। অতএব এই উন্মাদসমাজ সেই আলেকজাণ্ডারকেই উন্মাদ বলে জোর করে ধরে নিয়ে যায় উন্মাদাগারে, যদিও আলেকজাণ্ডার এক সুস্থ পৃথিবীকেই আবাহন করতে চেয়েছিল।

আর আলেকজাণ্ডারের মৌনব্রতের বিপরীত বিন্দুতে দেখা গেল এতক্ষণ চুপ করে থাকা আলেকজাণ্ডরের ছোট্ট ছেলেটা হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছে। 'ইন দি বিগিনিং দেয়ার ওয়াজ দি ওয়ার্ড, হোয়াই পাপা?' বাবার কথামতো পাতাহীন মরা গাছটার গোড়ায় সে নিয়মিত জল দেয়। এক আশ্চর্য বিশ্বাসের জল। মানুষের প্রত্যয়হীন সমাজ যা হয়ত একদিন প্রাণসঞ্চার করবে। ছোট্ট গাছটা মহীরুহের মতো তার শুকনো ডালপালা যেন কল্পনায় মেলে ধরছে···আরও কাছে এসে আরও বড় হয়ে উঠছে সে। পেছনে জলন্ত সূর্য আর আশার সঙ্গীত-তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। একদিন কি সত্যি সত্যিই পাতায় ভরে যাবে এই মরা ডালগুলো? সত্যি সত্যিই কি প্রাণের সঞ্চার ঘটবে? স্মৃতির আর স্বপ্নের পুনর্জন্মে, জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসায় কি জীবনের উৎসব আবার শুরু হবে নতুন করে? সেই ভালবাসা আর প্রত্যয়ে আমরা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি। □